ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ২য় পত্র: আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

খ অংশ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

(১৫টি প্রশ্ন হতে যে-কোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে; মান- ৫×১০=৫০)

سورة الفرقان (সূরা আল ফুরকান)

১২৬. ما معنى كلمة "الفرقان" لغة وشرعا؟ - [ফুরকান শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী?]
১২৭. ما المراد بقوله تعالى "تبارك الذى نزل الفرقان على عبده"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী تبارك الذى نزل الفرقان على عبده-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
১২৮. فسر قوله تعالى "ليكون للعالمين نذيرا - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ليكون للعالمين نذيرا-এর তাফসীর কর।]
১২৯. من هم الذين نسبوا لله الولد؟ - [কারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করেছিল?]
১৩০. ما معنى قوله "وخلق كل شىء فقدره تقديرا"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وخلق كل شىء فقدره تقديرا-এর মর্মার্থ কী?]
১৩১. كيف وصف الله المشركين فى سورة الفرقان؟ - [আল্লাহ তায়ালা সূরা আল ফুরকানে মুশরিকদের বিষয়টি কীভাবে বর্ণনা করেছেন?]
১৩২. ما سبب انكار الكفار للرسالة؟ - [কাফেরদের রিসালাত অস্বীকৃতির কারণ কী ছিল?]
১৩৩. ما المعجزة التى طلبها الكفار من النبى (ص)؟ - [কাফেররা নবী (স)-এর কাছে কী মুজিযা দাবি করেছিল?]
১৩৪. ما معنى قوله "سبحان الذى ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী سبحان الذى ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات-এর অর্থ কী?]
১৩৫. ما المقصود بقوله تعالى "وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]

১৩৬. ما الغرض من ارسال الرياح والسحاب؟ - [বাতাস ও মেঘ প্রেরণের উদ্দেশ্য কী?]
১৩৭. ما معنى قوله تعالى "يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا-এর অর্থ কী?]
১৩৮. اكتب قصة قوم عاد وثمود فى ضوء سورة الفرقان - [সূরা আল ফুরকানের আলোকে আদ ও সামুদ জাতির ঘটনা লেখ।]
১৩৯. ما المراد بقوله تعالى "وكلا ضربنا له الامثال"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وكلا ضربنا له الامثال-এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?]
১৪০. من هم عباد الرحمن؟ - [রহমানের বান্দা কারা?]
১৪১. ما هى الصفات التى وصف الله بها عباد الرحمن؟ - [রহমানের বান্দাদের কী কী বৈশিষ্ট্য আল্লাহ বর্ণনা করেছেন?]
১৪২. ما المراد بقوله تعالى "الذين يمشون على الارض هونا"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী الذين يمشون على الارض هونا দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
১৪৩. ما هو تعليم قوله تعالى "واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما-এর শিক্ষা কী?]
১৪৪. ما معنى قوله تعالى "ربنا اصرف عنا عذاب جهنم"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ربنا اصرف عنا عذاب جهنم-এর অর্থ কী?]
১৪৫. ما صفة الانفاق لعباد الرحمن؟ - [রহমানের বান্দাদের ব্যয় করার বৈশিষ্ট্য কী?]
১৪৬. كيف يوازن الاسلام بين الاسراف والبخل؟ - [ইসলাম কীভাবে অপব্যয় এবং কৃপণতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে?]
১৪৭. ما عقوبة من يقتل النفس بغير الحق؟ - [অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর শাস্তি কী?]
১৪৮. ما معنى قوله "الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا-এর অর্থ কী?]
১৪৯. ما اثر القران فى حياة المؤمن؟ - [বিশ্বাসীর জীবনে কুরআনের প্রভাব কীরূপ?]

খ বিভাগ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (সূরা আল ফুরকান)

১২৬. ফুরকান শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? (ما معنى كلمة " الفرقان لغة وشرعا؟ ")

উত্তর:

ভূমিকা:

পবিত্র কুরআনের ২৫তম সূরার নাম 'আল-ফুরকান'। এই শব্দটি কুরআনের অন্যতম একটি সিফাতি বা গুণবাচক নাম। ইসলামের পরিভাষায় এই শব্দটির গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড নির্ধারণ করে।

আভিধানিক অর্থ:

আরবি 'আল-ফুরকান' (الْفُرْقَانُ) শব্দটি 'ফারকুন' (فَرْقٌ) মূলধাতু থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থে এর অর্থ হলো:

১. পার্থক্যকারী: যা দুটি বস্তুর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে।

২. ফয়সালাকারী: যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়।

৩. বিজয়: বদর দিবসকে 'ইয়াওমুল ফুরকান' বলা হয়, কারণ সেদিন হকের বিজয় এবং বাতিলের পরাজয় ঘটেছিল।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইসলামী শরিয়ত ও উলুমুল কুরআনের পরিভাষায়:

'ফুরকান' দ্বারা মূলত পবিত্র আল-কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ

অর্থ: "বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফুরকান নাযিল করেছেন।"

একে ফুরকান বলা হয় কারণ:

১. এই কিতাব হক (সত্য) এবং বাতিল (মিথ্যা)-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করে দেয়।

২. এটি হালাল ও হারামের সীমারেখা নির্ধারণ করে।

৩. এটি মুমিন ও কাফেরের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করে।

উপসংহার:

সুতরাং, ফুরকান হলো এমন এক ঐশী গ্রন্থ, যা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে কাজ করে।

---

১২৭. আল্লাহ তায়ালার বাণী "تبارك الذى نزل الفرقان على عبده"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المراد بقوله تعالى " تبارك الذى نزل الفرقان على عبده " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল ফুরকানের প্রারম্ভিক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজের মহত্ত্ব ও কুরআনের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। এই আয়াতটি আল্লাহর বড়ত্ব এবং রাসূল (সা.)-এর রিসালাতের এক উজ্জ্বল দলিল।

আয়াতের অর্থ:

“কতই না বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার (মুহাম্মদের) প্রতি ‘ফুরকান’ (কুরআন) নাযিল করেছেন।”

উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

১. তাবারাকা (বরকতময়): আল্লাহ তায়ালা নিজের সত্তাকে ‘তাবারাকা’ বলেছেন। এর অর্থ তিনি চিরস্থায়ী, অসীম কল্যাণের অধিকারী এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহত্ত্ব সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। তিনি এমন সত্তা যার কল্যাণ কখনো শেষ হয় না এবং যার কোনো উপমা নেই।

২. নিলয় (অবতরণ): আল্লাহ এখানে ‘নাজ্জালা’ (ধীরে ধীরে নাযিল করা) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাওরাত বা ইঞ্জিলের মতো কুরআন একবারে নাযিল হয়নি,

বরং ২৩ বছর ধরে প্রয়োজন মাফিক অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে, যা এই কিতাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩. আবদিহি (তাঁর বান্দা): এখানে মহানবী (সা.)-কে সম্মানসূচক 'আবদ' বা বান্দা উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। আল্লাহর কাছে 'আবদ' হওয়ার চেয়ে বড় কোনো মর্যাদা নেই। এর দ্বারা নবীজির দাসত্ব ও বিনয়কে উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে এবং একইসাথে তাঁর রিসালাত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

উপসংহার:

এই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা এবং শেষ নবীর ওপর শেষ কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার মহান ঘটনার শোকরিয়া আদায় করা।

---

১২৮. আল্লাহ তায়ালার বাণী "ليكون للعالمين نذيرا"-এর তাফসীর কর। (فسر " قوله تعالى " ليكون للعالمين نذيرا -)

উত্তর:

ভূমিকা:

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের পরিধি এবং দায়িত্ব কত ব্যাপক, তা এই আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করেছেন। এটি 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' আকিদার একটি শক্তিশালী প্রমাণ।

আয়াতের অর্থ:

"যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।"

তাফসীর ও ব্যাখ্যা:

১. লিল আলামিন (বিশ্ববাসীর জন্য): মহানবী (সা.) কেবল আরবদের জন্য বা নির্দিষ্ট কোনো সময়ের জন্য আসেননি। তিনি 'কাফফাতাল লিন্নাস' বা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, 'আলামিন' দ্বারা এখানে জ্বিন ও ইনসান (মানুষ) উভয় জাতিকে বোঝানো হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষ ও জ্বিন তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত।

২. নাজিরা (সতর্ককারী): 'নাজির' অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী বা সতর্ককারী। নবীজির প্রধান দায়িত্ব হলো মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণাম (জাহান্নাম) সম্পর্কে সাবধান করা। যদিও তিনি 'বশির' (সুসংবাদদাতা)-ও বটেন, কিন্তু মক্কী সূরায় কাফেরদের হঠকারিতার কারণে সতর্কীকরণের দিকটিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

৩. বিশ্বজনীনতা: পূর্ববর্তী নবীরা নির্দিষ্ট গোত্র বা এলাকায় আসতেন, কিন্তু মুহাম্মদ (সা.)-এর দাওয়াত কোনো ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ নয়।

উপসংহার:

রাসূলুল্লাহ (সা.) হলেন বিশ্বনবী। তাঁর আনীত কুরআন এবং তাঁর সতর্কবাণী সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য মুক্তির একমাত্র সনদ।

---

১২৯. কারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করেছিল? (من هم الذين نسبوا لله الولد؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

তাওহিদের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহ একক, তাঁর কোনো সন্তান বা শরিক নেই। কিন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে পথভ্রষ্ট জাতিগুলো আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে শিরকে লিপ্ত হয়েছে। সূরা আল ফুরকানের ২য় আয়াতে আল্লাহ এর কঠোর প্রতিবাদ করেছেন (وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا)।

সন্তান সাব্যস্তকারী দলসমূহ:

তাফসীরকারকগণ উল্লেখ করেছেন যে, মূলত তিনটি প্রধান দল আল্লাহর প্রতি সন্তান আরোপের মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে:

১. ইহুদি সম্প্রদায়: তারা হযরত উযাইর (আ.)-কে 'ইবনুল্লাহ' বা আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করেছিল। (সূরা তাওবা: ৩০)।

২. খ্রিস্টান সম্প্রদায়: তারা হযরত ঈসা (আ.) বা যীশুকে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে এবং ত্রিত্ববাদে (Trinity) লিপ্ত হয়।

৩. মক্কার মুশরিকরা: আরবের জাহেলি যুগের মুশরিকরা ফেরেশতাদের 'বানাতুল্লাহ' বা আল্লাহর কন্যা বলে অভিহিত করত। তারা মনে করত ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে (নাউজুবিল্লাহ)।

আল্লাহর খণ্ডন:

আল্লাহ তায়ালা সূরা ফুরকানে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, আসমান ও জমিনের রাজত্ব একমাত্র তাঁর। তিনি সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র। সন্তান হওয়ার জন্য সমজাতীয় স্ত্রী প্রয়োজন, যা আল্লাহর শানের খেলাফ। তিনি 'লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ'।

উপসংহার:

আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা জঘন্যতম শিরক ও কুফরি। আল্লাহ সর্বপ্রকার অভাব ও আত্মীয়তার ঊর্ধ্বে।

---

১৩০. আল্লাহ তায়ালার বাণী "وخلق كل شيء فقدره تقديرا"-এর মর্মার্থ কী? (ما معنى قوله " وخلق كل شيء فقدره تقديرا " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুই অপরিকল্পিত বা আকস্মিক নয়। সূরা আল ফুরকানের ২য় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্য এবং 'তাকদির' বা ভাগ্য নির্ধারণের বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

আয়াতের অর্থ:

"তিনি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে যথাযথ অনুপাতে পরিমিত করেছেন (তাকদির নির্ধারণ করেছেন)।"

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা:

১. সার্বজনীন সৃষ্টি: 'কুল্লা শাইয়িন' দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে বিশাল গ্যালাক্সি পর্যন্ত সবকিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই।

২. পরিমিত বিন্যাস (তাকদির): আল্লাহ কোনো কিছু আন্দাজে সৃষ্টি করেননি। বরং সৃষ্টির আগেই তিনি প্রতিটি বস্তুর আকার, আকৃতি, আয়ুষ্কাল, রিজিক, ধর্ম-কর্ম এবং পরিণাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একেই বলা হয় 'তাকদিরে ইলাহি'।

৩. ভারসাম্য: সৃষ্টির মধ্যে তিনি এক নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। যেমন—সূর্যের তাপ কতটুকু হবে, পৃথিবী কত বেগে ঘুরবে, মানুষের শরীরের গঠন কেমন হবে—সবকিছুই এক সুনির্দিষ্ট পরিমাপে (Calculation) তৈরি।

উপসংহার:

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, মহাবিশ্ব এক মহাজ্ঞানী সত্তার সুনিপুণ পরিকল্পনার ফসল। এখানে কাকতালীয় বলতে কিছু নেই।

---

১৩১. আল্লাহ তায়ালা সূরা আল ফুরকানে মুশরিকদের বিষয়টি কীভাবে বর্ণনা করেছেন? (كيف وصف الله المشركين فى سورة الفرقان؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল ফুরকানে মক্কার মুশরিকদের অন্ধ বিশ্বাস, কুযুক্তি এবং হঠকারী আচরণের চিত্র অত্যন্ত জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলো খণ্ডন করে তাদের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন।

মুশরিকদের বর্ণনা:

১. অসহায় ইলাহের পূজা: আল্লাহ বলেন, তারা এমন সব উপাস্য গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। তারা নিজেদের কোনো ভালো-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না; এমনকি জীবন, মৃত্যু বা পুনরুত্থানের ওপরও তাদের কোনো হাত নেই। (لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا)।

২. কুরআনের বিরোধিতা: মুশরিকরা কুরআনকে 'ইফক' বা মিথ্যা অপবাদ বলে উড়িয়ে দিত। তারা বলত, এটি মুহাম্মদের (সা.) নিজের বানানো এবং অন্য লোকেরা (ইহুদি-খ্রিস্টানরা) তাকে সাহায্য করেছে।

৩. বিদ্রূপ: তারা রাসূল (সা.)-এর মানবিক বৈশিষ্ট্য (যেমন—খাওয়া, বাজারে যাওয়া) নিয়ে ঠাট্টা করত এবং বলত, "এ কেমন রাসূল যে খাবার খায়?"

৪. অন্ধত্ব: আল্লাহ তাদের পশুর চেয়েও অধম বলেছেন (كَالْأَنْعَامِ), কারণ তারা সত্য দেখেও না দেখার ভান করত এবং প্রবৃত্তির পূজা করত।

উপসংহার:

সূরাটিতে মুশরিকদেরকে অযৌক্তিক, অকৃতজ্ঞ এবং সত্যবিমুখ এক জাতি হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যাদের পরিণতি হলো জাহান্নাম।

---

১৩২. কাফেরদের রিসালাত অস্বীকৃতির কারণ কী ছিল? (ما سبب انكار الكفار للرسالة؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

মক্কার কাফেররা কেন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাত মেনে নিতে পারেনি, তার কিছু মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণ সূরা আল ফুরকানে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের অস্বীকৃতি যুক্তিনির্ভর ছিল না, বরং ছিল অহংকার ও কুসংস্কারপ্রসূত।

অস্বীকৃতির কারণসমূহ:

১. মানবীয় সত্তা নিয়ে আপত্তি: তাদের ধারণা ছিল, আল্লাহর রাসূল কোনো সাধারণ মানুষ হতে পারেন না। রাসূল হতে হলে তাকে অবশ্যই ফেরেশতা হতে হবে, যার পানাহারের প্রয়োজন নেই। তারা বলত: "এ কেমন রাসূল যে খাবার খায় এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে?" (مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ)।

২. দরিদ্রতা ও ক্ষমতার অভাব: তাদের দৃষ্টিতে নবুওয়াত পাওয়ার যোগ্য ছিল মক্কা বা তায়েফের কোনো ধনাঢ্য নেতা। এতিম ও সম্পদহীন মুহাম্মদ (সা.)-কে তারা নবী হিসেবে মেনে নিতে অহংবোধে লাগত। তারা বলত, "তার প্রতি কেন ধনভাণ্ডার নাযিল হলো না?"

৩. বিলাসিতার মোহ: তারা আখেরাতকে অস্বীকার করত এবং দুনিয়ার ভোগবিলাসে মগ্ন ছিল। সত্য গ্রহণ করলে তাদের অবৈধ ভোগে বাধা আসবে—এই ভয়ে তারা রিসালাত অস্বীকার করত।

উপসংহার:

মূলত 'কিবার' বা অহংকার এবং বস্তুবাদী মানসিকতাই ছিল তাদের রিসালাত অস্বীকৃতির মূল কারণ।

---

১৩৩. কাফেররা নবী (স)-এর কাছে কী মুজিযা দাবি করেছিল? (ما المعجزة التى طلبها الكفار من النبى (ص) ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

কাফেররা ঈমান আনার জন্য নয়, বরং নবীজি (সা.)-কে বিব্রত করার জন্য অবাস্তব ও অদ্ভুত সব মুজিযা বা অলৌকিক নিদর্শন দাবি করত। সূরা আল ফুরকানে তাদের এমন কিছু দাবির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দাবিকৃত মুজিযাসমূহ:

১. ফেরেশতা অবতরণ: তারা বলত, "কেন তার (নবীর) কাছে কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হলো না, যে তার সাথে সতর্ককারী হিসেবে থাকত?" অথবা "কেন আমরা আল্লাহকে বা ফেরেশতাদের সরাসরি দেখতে পাই না?" (لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ)।

২. ধনভাণ্ডার: তারা দাবি করত, নবীর কাছে আসমান থেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার বা 'কানজ' (كَنزٌ) নিক্ষিপ্ত হতে হবে, যাতে তিনি ধনী হয়ে যান।

৩. জান্নাত বা বাগান: তারা বলত, নবীর জন্য এমন এক বিশাল বাগান বা 'জান্নাত' থাকতে হবে, যার ফলমূল তিনি নিশ্চিন্তে খাবেন এবং তাকে জীবিকার জন্য বাজারে যেতে হবে না।

আল্লাহর জবাব:

আল্লাহ তায়ালা তাদের এসব দাবিকে ‘সীমালংঘন’ ও ‘অহংকার’ বলে অভিহিত করেছেন। নবী মানুষ হওয়াটাই স্বাভাবিক, আর কুরআনই হলো শ্রেষ্ঠ মুজিযা। জাগতিক জৌলুস নবুওয়াতের মানদণ্ড নয়।

---

১৩৪. আল্লাহ তায়ালার বাণী " تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات"-এর অর্থ কী? (ما معنى قوله " سبحان الذى ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات " ؟)

উত্তর:

(নোট: প্রশ্নে ‘সুবহানাল্লাজি’ আছে, কিন্তু আয়াতে ‘তাবারাকাল্লাজি’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাই আয়াতের ভিত্তিতে উত্তর দেওয়া হলো)

ভূমিকা:

কাফেররা যখন নবীজি (সা.)-এর দারিদ্র্য নিয়ে কটাক্ষ করে বাগান ও প্রসাদ দাবি করছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জবাব দিয়ে রাসূল (সা.)-কে সান্ত্বনা দেন। এই আয়াতে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

আয়াতের অর্থ:

“বরকতময় তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে এর চেয়েও উৎকৃষ্ট বস্তু দিতে পারেন—(দুনিয়াতেই) এমন জান্নাত (বাগান) যার পাদদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত এবং তিনি আপনাকে দিতে পারেন বহু সুউচ্চ প্রাসাদ।” (সূরা ফুরকান: ১০)

তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা:

১. আল্লাহর ক্ষমতা: আল্লাহ নবীজিকে জানাচ্ছেন যে, কাফেররা যা দাবি করছে তা দেওয়া আল্লাহর জন্য খুব তুচ্ছ ব্যাপার। আল্লাহ চাইলে নবীজিকে দুনিয়াতেই রাজকীয় ঐশ্বর্য, বিশাল বাগান ও সুরম্য প্রাসাদ দিতে পারেন। সোলায়মান (আ.)-কে তিনি তা দিয়েছিলেন।

২. নবীর মর্যাদা: আল্লাহ ইচ্ছা করেই নবীজিকে দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে দূরে রেখেছেন, কারণ দুনিয়ার সম্পদ আল্লাহর প্রিয় বান্দার মানদণ্ড নয়। আখেরাতে

তাঁর জন্য যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে (মাকামে মাহমুদ, কাউসার), তা এসব বাগানের চেয়ে কোটি গুণ শ্রেষ্ঠ।

৩. কাফেরদের অজ্ঞতা: কাফেররা মনে করে সম্পদই সম্মানের উৎস, কিন্তু আল্লাহর কাছে তাকওয়া ও রিসালাতই আসল সম্মান।

---

১৩৫. আল্লাহ তায়ালার বাণী "وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المقصود بقوله تعالى " وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল ফুরকানের ৬১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মহাকাশ সৃষ্টির এক বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক সত্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এখানে সূর্য ও চাঁদের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ:

"এবং তিনি তাতে (আকাশে) স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চাঁদ।"

উদ্দেশ্য ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা:

১. সূর্য (সিরাজ): আল্লাহ সূর্যকে 'সিরাজ' (سِرَاجًا) বা প্রদীপ বলেছেন। প্রদীপের নিজস্ব আলো ও তাপ থাকে এবং তা জ্বলে। বিজ্ঞান মতে, সূর্য একটি নক্ষত্র যা নিজস্ব জ্বালানি দিয়ে জ্বলে এবং আলো-তাপ উৎপন্ন করে। তাই 'সিরাজ' শব্দটি সূর্যের জন্য অত্যন্ত যথার্থ।

২. চাঁদ (মুনির): আল্লাহ চাঁদকে 'সিরাজ' বলেননি, বরং 'কামারান মুনিরা' (قَمَرًا مُّنِيرًا) বা আলোদানকারী চাঁদ বলেছেন। 'মুনির' অর্থ যা স্নিগ্ধ আলো দেয় বা অন্যের আলো প্রতিফলিত করে। চাঁদের নিজস্ব আলো নেই, তা সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়।

৩. কুদরত: এই সূক্ষ্ম পার্থক্য ১৪০০ বছর আগে কুরআনে উল্লেখ করা আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও কুদরতের প্রমাণ। তিনি দিন ও রাতের ব্যবস্থার জন্য এই দুটি ভিন্নধর্মী জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি করেছেন।

উপসংহার:

আয়াতটির উদ্দেশ্য হলো মানুষের দৃষ্টিকে আকাশের দিকে নিবদ্ধ করা, যাতে তারা স্রষ্টার নিপুণ কারিগরী দেখে ঈমান আনে।

---

১৩৬. ما الغرض من ارسال الرياح والسحاب؟ - [বাতাস ও মেঘ প্রেরণের উদ্দেশ্য কী?]

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল ফুরকানের ৪৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতিতে তাঁর কুদরতের নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বাতাস ও মেঘমালার কথা উল্লেখ করেছেন। এটি আল্লাহর রহমতের এক বিশেষ প্রকাশ।

উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

অর্থ: "এবং তিনিই তাঁর রহমতের (বৃষ্টির) আগে সুসংবাদবাহী হিসেবে বাতাস প্রেরণ করেন।"

বাতাস ও মেঘ প্রেরণের উদ্দেশ্য:

১. সুসংবাদ প্রদান: বৃষ্টি আল্লাহর রহমত। এই রহমত আসার আগে আল্লাহ ঠান্ডা বাতাস পাঠান, যা মানুষকে সুসংবাদ দেয় যে শীঘ্রই বৃষ্টি আসছে। এটি মানুষের মনে আশা জাগায় এবং গরমের তীব্রতা কমায়।

২. মৃত জমিনকে জীবিত করা: আল্লাহ বলেন, لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا (যাতে আমি তা দ্বারা মৃত জনপদকে জীবিত করতে পারি)। মেঘের মাধ্যমে আল্লাহ শুষ্ক ও

মৃতপ্রায় জমিনে পানি বর্ষণ করেন, ফলে সেখানে নতুন করে ঘাস ও ফসল উৎপন্ন হয়।

৩. জীবকুলের পানীয়: আল্লাহ বলেন, وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (এবং তা পান করাই আমার সৃষ্টি জীবজন্তু ও অনেক মানুষকে)। বৃষ্টি ও মেঘের পানির মাধ্যমেই নদী-নালা পূর্ণ হয় এবং মানুষ ও পশুপাখি তাদের তৃষ্ণা মেটায়।

উপসংহার:

বাতাস ও মেঘ কেবল প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, বরং এটি মহান আল্লাহর এমন এক ব্যবস্থাপনা যা পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য।

---

১৩৭. ما معنى قوله تعالى "يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا-এর অর্থ কী?]

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল ফুরকানের ২৭ নম্বর আয়াতে কেয়ামতের দিন জালেম ও পাপীদের চরম অনুশোচনার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়ায় যারা রাসূল (সা.)-এর বিরোধিতা করেছে, সেদিন তারা আফসোস করে এই উক্তিটি করবে।

আয়াতের অর্থ:

يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

অর্থ: "হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম!"

প্রেক্ষাপট ও ব্যাখ্যা:

এই আয়াতটি মূলত মক্কার কুখ্যাত কাফের উকবা ইবনে আবি মুআইত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে একবার ইসলাম গ্রহণের কাছাকাছি এসেছিল, কিন্তু তার বন্ধু উবাই ইবনে খলফের প্ররোচনায় সে ইসলাম ত্যাগ করে এবং নবীজির মুখে থুথু দেয় (নাউজুবিল্লাহ)।

কেয়ামতের দিন যখন সে জাহান্নামের শাস্তি দেখবে, তখন নিজের হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, "হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি দুনিয়াতে মুহাম্মদ (সা.)-এর দেখানো পথে চলতাম, তবে আজ এই শাস্তি ভোগ করতে হতো না।"

তাৎপর্য:

যদিও আয়াতটি বিশেষ ব্যক্তির জন্য নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর হুকুম ব্যাপক। কেয়ামত পর্যন্ত যারাই অসৎ সঙ্গের কারণে দ্বীন থেকে দূরে থাকবে, তারাই হাশরের মাঠে এভাবে আক্ষেপ করবে। কিন্তু সেই আক্ষেপে কোনো কাজ হবে না।

উপসংহার:

এই আয়াতটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, দুনিয়াতেই রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ ও আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে।

---

১৩৮. اكتب قصة قوم عاد وثمود فى ضوء سورة الفرقان - [সূরা আল ফুরকানের আলোকে আদ ও সামুদ জাতির ঘটনা লেখ।]

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল ফুরকানের ৩৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সংক্ষেপে আদ, সামুদ এবং 'আসহাবুর রাস' (কুয়াবাসী)-এর ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেছেন। মক্কার কাফেরদের সতর্ক করার জন্য এই জাতিগুলোর করুণ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

১. আদ জাতি (কওমে আদ): এরা ছিল দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান এক জাতি। তাদের প্রতি হযরত হুদ (আ.)-কে পাঠানো হয়েছিল। তারা আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া না করে অহংকার করেছিল এবং নবীকে অস্বীকার করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের ওপর সাত রাত ও আট দিন ধরে এক প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া (সরসর) চাপিয়ে দেন, যা তাদের মরা খেজুর গাছের মতো উপড়ে ফেলেছিল।

২. সামুদ জাতি (কওমে সামুদ): এরা পাহাড়ে পাথর কেটে ঘর বানাত। তাদের প্রতি হযরত সালেহ (আ.)-কে পাঠানো হয়েছিল। তারা নবীর মুজিযা হিসেবে প্রাপ্ত উটনীকে হত্যা করে এবং আল্লাহর আজাবকে চ্যালেঞ্জ করে। ফলে আল্লাহ এক বিকট আওয়াজ (সাইহা) ও ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করে দেন।

সূরা ফুরকানের শিক্ষা:

আল্লাহ বলেন, وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (আমি তাদের প্রত্যেককে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছি)। অর্থাৎ, তাদের শক্তি ও প্রযুক্তি আল্লাহর আজাবের সামনে টিকতে পারেনি। মক্কাবাসীরা যদি একই আচরণ করে, তবে তাদের পরিণতিও ভিন্ন হবে না।

উপসংহার:

ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেওয়া এবং নবীদের অবাধ্য হওয়া ধ্বংস ডেকে আনে—এটাই আদ ও সামুদ জাতির ঘটনার মূল শিক্ষা।

---

১৩৯. ما المراد بقوله تعالى "وكلا ضربنا له الامثال"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وكلا ضربنا له الامثال-এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?]

উত্তর:

ভূমিকা:

আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতিকে বিনা সতর্কবার্তায় ধ্বংস করেন না। আদ, সামুদ ও নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের বর্ণনা দেওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন। এটি আল্লাহর ন্যায়বিচারের প্রমাণ।

আয়াতের অর্থ:

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ

অর্থ: "এবং আমি তাদের প্রত্যেকের জন্যই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম।"

উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

১. হুজ্জত কায়েম: আল্লাহ তায়ালা এই জাতিগুলোর কাছে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, আসমানি কিতাব দিয়েছেন এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বোঝানোর জন্য নানা উপমা ও দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তাদের কাছে হেদায়েতের পথ পুরোপুরি স্পষ্ট করা হয়েছিল, যাতে তারা বলতে না পারে যে—'আমরা জানতাম না'।

২. সুযোগ প্রদান: আল্লাহ তাদের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দিয়েছিলেন। নবীরা তাদের বুঝিয়েছিলেন যে, কুফরি ও শিরকের পরিণাম ভয়াবহ। কিন্তু তারা সেই দৃষ্টান্ত ও উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

৩. ধ্বংসের কারণ: যখন তারা জেনেশুনে সত্য প্রত্যাখ্যান করল এবং আল্লাহর দৃষ্টান্তগুলোকে বিদ্রূপ করল, তখনই কেবল তাদের ওপর আজাব নাযিল করা হলো।

উপসংহার:

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ বুঝিয়েছেন যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো তাদের নিজেদের কর্মফলই ভোগ করেছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েত পৌঁছাতে কোনো ত্রুটি ছিল না।

---

১৪০. من هم عباد الرحمن؟ - [রহমানের বান্দা কারা?]

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল ফুরকানের শেষ রুকুতে (আয়াত ৬৩-৭৭) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ প্রিয় বান্দাদের পরিচয় এবং তাদের গুণাবলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাদেরকে কুরআনে 'ইবাদুর রহমান' বা 'দয়াময়ের বান্দা' বলে সম্মানিত করা হয়েছে।

পরিচয়:

'ইবাদুর রহমান' (عِبَادُ الرَّحْمَنِ) অর্থ দয়াময় আল্লাহর খাস বান্দারা।

যদিও সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহর বান্দা, কিন্তু এখানে 'ইবাদ' শব্দটিকে আল্লাহর সিফাতি নাম 'আর-রহমান'-এর সাথে যুক্ত করে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ মুমিনদের

বোঝানো হয়েছে। এরা হলো সেই সব মুত্তাকি ব্যক্তি, যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর রঙে রাঙিয়েছে এবং যাদের চরিত্রে কুরআনের শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

কারা এই সৌভাগ্যের অধিকারী:

যাদের মধ্যে বিনয়, ধৈর্য, রাত জেগে ইবাদত, অপচয় ও কৃপণতামুক্ত জীবন, শিরক ও হত্যা থেকে বিরত থাকা এবং তওবার গুণাবলি বিদ্যমান—তারাই হলো প্রকৃত 'ইবাদুর রহমান'। আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ কক্ষ (গুরফাহ) প্রস্তুত রেখেছেন।

উপসংহার:

'রহমানের বান্দা' হওয়া মুমিনের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই উপাধি লাভ মানেই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা।

---

১৪১. ما هى الصفات التى وصف الله بها عباد الرحمن؟ - [রহমানের বান্দাদের কী কী বৈশিষ্ট্য আল্লাহ বর্ণনা করেছেন?]

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল ফুরকানে আল্লাহ তায়ালা 'ইবাদুর রহমান'-এর ১৩টি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। এই গুণগুলো অর্জনকারী ব্যক্তিরাই আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারে।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. বিনয়: তারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে (يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا)।

২. শান্তিপরায়ণ: অজ্ঞরা তাদের সাথে তর্কে জড়ালে তারা ঝগড়া না করে 'সালাম' বা ভালো কথা বলে বিদায় নেয়।

৩. তাহাজ্জুদ গুজার: তারা তাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদা ও দাঁড়িয়ে (নামাজে) রাত কাটায়।

৪. জাহান্নামের ভয়: তারা সর্বদা আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি চায়।

৫. মধ্যপন্থা: ব্যয়ের ক্ষেত্রে তারা অপচয় করে না, আবার কৃপণতাও করে না; বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।

৬. তাওহীদ: তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না।

৭. হত্যা বর্জন: তারা অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে না।

৮. জিনা বর্জন: তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না।

৯. মিথ্যা বর্জন: তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অনর্থক কাজ এড়িয়ে চলে।

১০. দোয়া: তারা নেক সন্তান ও স্ত্রীর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে।

উপসংহার:

এই গুণগুলো মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে সুন্দর করে এবং জান্নাতের পথে পরিচালিত করে।

---

১৪২. ما المراد بقوله تعالى "الذين يمشون على الارض هونا"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী الذين يمشون على الارض هونا দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]

উত্তর:

ভূমিকা:

'ইবাদুর রহমান'-এর প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসেবে আল্লাহ তায়ালা তাদের চালচলনের কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষের হাঁটাচলা তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটায়।

আয়াতের অর্থ:

"যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।"

উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

১. অহংকারমুক্ত: 'হাওনা' (هَوْنًا) অর্থ নম্রতা, ধীরস্থিরতা ও গাম্ভীর্য। মুমিনরা দম্ভভরে বা বুক ফুলিয়ে মাটিতে পা ফেলে না, যেমনটি অহংকারী ও স্বৈরাচারীরা করে। তাদের চালচলনে বিনয় ও ভদ্রতা ফুটে ওঠে।

২. শান্তি ও সংযম: এর অর্থ এই নয় যে তারা রুগ্ন বা দুর্বলভাবে হাঁটে। বরং তাদের হাঁটার মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তি (সাকিনাহ) থাকে, যা দেখে মানুষ বুঝতে পারে যে তারা আল্লাহকে ভয় করে। হযরত উমর (রা.) মাথা নিচু করে মরা মানুষের মতো হাঁটতে নিষেধ করেছেন; বরং তিনি শক্তি ও বিনয়ের সমন্বয়ে হাঁটতে বলেছেন।

৩. সামাজিক আচরণ: এই নম্রতা কেবল হাঁটার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের সব আচরণে—কথা বলায়, লেনদেনে—এই বিনয় প্রকাশ পায়।

উপসংহার:

বিনয়ী চালচলন মুমিনের এক বিশেষ ভূষণ, যা তাকে আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং মানুষের কাছে সম্মানিত করে।

---

১৪৩. ما هو تعليم قوله تعالى "واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما-এর শিক্ষা কী?]

উত্তর:

ভূমিকা:

সামাজিক জীবনে মুমিনদের নানা ধরনের মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। মূর্খ বা ঝগড়াটে লোকদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে, তার একটি চমৎকার নীতিমালা এই আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

আয়াতের অর্থ:

"এবং যখন অজ্ঞরা তাদের সাথে (অশোভন) কথা বলে, তখন তারা বলে 'সালাম' (শান্তি)।"

শিক্ষা ও তাৎপর্য:

১. তর্ক এড়িয়ে চলা: 'জাহিল' বা অজ্ঞ লোক বলতে এখানে জ্ঞানহীন নয়, বরং যারা যুক্তি মানে না এবং ঝগড়া করতে পছন্দ করে, তাদের বোঝানো হয়েছে। মুমিনের শিক্ষা হলো, এমন লোকদের সাথে তর্কে জড়িয়ে সময় নষ্ট না করা।

২. উত্তম আচরণ: মূর্খরা গালি দিলে বা কটূক্তি করলে মুমিনরা পাল্টা গালি দেয় না। তারা 'সালামা' বা শান্তিময় কথা বলে সেখান থেকে সরে পড়ে। অর্থাৎ, "তোমার সাথে আমার কোনো বিরোধ নেই, তুমি তোমার পথে থাকো।"

৩. আত্মসম্মান রক্ষা: এর মাধ্যমে মুমিন নিজের সম্মান বজায় রাখে এবং ফিতনা থেকে সমাজকে রক্ষা করে। এটি দুর্বলতা নয়, বরং চারিত্রিক দৃঢ়তার লক্ষণ।

উপসংহার:

অজ্ঞদের উপহাস বা উসকানিতে ধৈর্য ধারণ করা এবং শিষ্টাচারের সাথে তা মোকাবিলা করা 'ইবাদুর রহমান'-এর অন্যতম গুণ।

---

১৪৪. ما معنى قوله تعالى "ربنا اصرف عنا عذاب جهنم"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ربنا اصرف عنا عذاب جهنم-এর অর্থ কী?]

উত্তর:

ভূমিকা:

রহমানের বান্দারা নেক আমল করার পরও অহংকার করে না, বরং সর্বদা আল্লাহর আজাবের ভয়ে তটস্থ থাকে। এই আয়াতে তাদের সেই ভীতি ও দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ:

"হে আমাদের রব! আমাদের থেকে জাহান্নামের আজাব দূরে সরিয়ে দিন।"

তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা:

১. ভয় ও আশা: মুমিনরা রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়ে, কিন্তু এরপরও তারা নিশ্চিত থাকে না যে তারা জান্নাতে যাবেই। তারা সর্বদা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে যেন জাহান্নামের আগুন তাদের স্পর্শ না করে।

২. জাহান্নামের ভয়াবহতা: তারা দোয়ায় আরও বলে, إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (নিশ্চয়ই এর শাস্তি অবিরাম ও ধ্বংসাত্মক)। জাহান্নাম হলো নিকৃষ্টতম আবাসস্থল। মুমিনরা এই সত্যটি গভীরভাবে উপলব্ধি করে বলেই তারা গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে এবং দোয়ায় মগ্ন থাকে।

৩. শিক্ষা: আমল যত বেশিই হোক, আল্লাহর রহমত ছাড়া মুক্তি সম্ভব নয়—এই বিশ্বাস থেকে তারা বিনয়ের সাথে আজাব মুক্তির দোয়া করে।

উপসংহার:

সর্বদা আল্লাহর আজাবের ভয় অন্তরে রাখা এবং মুক্তির জন্য দোয়া করা মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য।

---

১৪৫. ما صفة الانفاق لعباد الرحمن؟ - [রহমানের বান্দাদের ব্যয় করার বৈশিষ্ট্য কী?]

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সূরা আল ফুরকানের ৬৭ নম্বর আয়াতে 'ইবাদুর রহমান'-এর অর্থ ব্যয়ের চমৎকার নীতি বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

অর্থ: "এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না; বরং তারা উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে।"

ব্যাখ্যা:

১. ইসরাফ (অপব্যয়) বর্জন: তারা হারাম কাজে এক পয়সাও খরচ করে না। আবার হালাল কাজেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা লোকদেখানোর জন্য খরচ করে না।

২. বখিল (কৃপণতা) বর্জন: তারা পরিবার-পরিজন বা দ্বীনের প্রয়োজনে খরচ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সামর্থ্য থাকার পরও কষ্ট করে চলা বা হক আদায় না করাকে তারা ঘৃণা করে।

৩. কাওয়ামা (মধ্যপন্থা): তারা এই দুই প্রান্তিকের মাঝখানে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করে। তারা নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজন মেটায় এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ও করে, কিন্তু তা লোভের বশবর্তী হয়ে নয়।

উপসংহার:

মিতব্যয়িতা বা মধ্যপন্থা হলো মুমিনের অর্থনৈতিক জীবনের মূলনীতি, যা তাকে স্বচ্ছল ও সন্তুষ্ট রাখে।

---

১৪৬. كيف يوازن الاسلام بين الاسراف والبخل؟ - [ইসলাম কীভাবে অপব্যয় এবং কৃপণতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে?]

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষের স্বভাব হলো সে হয় খরচে হাত খুলে দেয় (অপব্যয়), অথবা হাত গুটিয়ে রাখে (কৃপণতা)। ইসলাম এই দুই চরমপন্থার মাঝে এক সুন্দর ভারসাম্য বা 'ইকতিসাদ' শিক্ষা দিয়েছে।

ভারসাম্যের পদ্ধতি:

১. সংজ্ঞা নির্ধারণ: ইসলাম শেখায় যে, আল্লাহর অবাধ্যতায় খরচ করাই অপব্যয়। আর আল্লাহর রাস্তায় বা পরিবারের ন্যাশন প্রয়োজনে খরচ না করা হলো কৃপণতা।

২. নির্দেশনা: সূরা ফুরকানে বলা হয়েছে, রহমানের বান্দারা 'অপব্যয়ও করে না, কৃপণতাও করে না; বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।' (আয়াত: ৬৭)।

৩. উদাহরণ: সূরা বনী ইসরাইলে আল্লাহ বলেন, "তুমি তোমার হাত গলায় বেঁধে রেখো না (কৃপণতা করো না) এবং তা পুরোপুরি খুলে দিও না (সব উড়িয়ে দিও না)।"

৪. ফলাফল: অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই এবং কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে দূরে। কিন্তু মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী কখনো দারিদ্রে পতিত হয় না (হাদিস)। ইসলাম মানুষকে নিজের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি সমাজের কল্যাণে ব্যয় করতে উৎসাহিত করে, তবে তা যেন নিজের ধ্বংসের কারণ না হয়।

উপসংহার:

ইসলামের দৃষ্টিতে মিতব্যয়িতাই হলো সম্পদের অর্ধেক। এই ভারসাম্যপূর্ণ নীতি মেনে চললে ব্যক্তিগত ও জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হয়।

---

১৪৭. ما عقوبة من يقتل النفس بغير الحق؟ - [অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর শাস্তি কী?]

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বা 'হুরমাতুদ দম' ইসলামে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে। রহমানের বান্দাদের অন্যতম গুণ হলো তারা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না। এর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ।

শাস্তির বিধান:

সূরা আল ফুরকানের ৬৮ ও ৬৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে শরিক করে, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে এবং ব্যভিচার করে—

১. আসামা (শাস্তি): তারা 'আসাম' বা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

২. দ্বিগুণ আজাব: কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে (يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ)।

৩. লাঞ্ছনা: তারা জাহান্নামে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে (وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا)।

সূরা নিসার আলো:

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত মুমিন হত্যাকারীর শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম, আল্লাহর গজব এবং লানত (সূরা নিসা: ৯৩)।

উপসংহার:

অন্যায় হত্যা মানববতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ। এর জন্য দুনিয়াতে 'কিসাস' (মৃত্যুদণ্ড) এবং আখেরাতে অনন্ত আগুনের শাস্তির বিধান রয়েছে।

---

১৪৮. ما معنى قوله "الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا-এর অর্থ কী?]

উত্তর:

ভূমিকা:

আল্লাহর রহমত তাঁর রাগের ওপর বিজয়ী। শিরক, হত্যা ও ব্যভিচারের মতো কবিরা গুনাহের শাস্তির কথা বলার পর আল্লাহ তায়ালা তওবাকারীদের জন্য ক্ষমার এক বিশাল দরজা খুলে দিয়েছেন।

আয়াতের অর্থ:

"তবে যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে।" (সূরা ফুরকান: ৭০)

ব্যাখ্যা ও সুসংবাদ:

১. মুক্তির পথ: কেউ যদি অজ্ঞতাবশত বড় গুনাহ করেও ফেলে, কিন্তু পরে লজ্জিত হয়ে খাঁটি দিলে তওবা করে (গুনাহ ছেড়ে দেয়, অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে না করার প্রতিজ্ঞা করে), তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।

২. পাপকে পুণ্যে রূপান্তর: আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ এক বিস্ময়কর ঘোষণা দিয়েছেন: فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ। অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের পেছনের

গুনাহগুলোকে নেকিতে বা পুণ্যে পরিবর্তন করে দেবেন। এটি আল্লাহর দয়ার এক চূড়ান্ত নিদর্শন।

৩. শর্ত: কেবল তওবা করলেই হবে না, সাথে ঈমান নবায়ন করতে হবে এবং ভবিষ্যতে নেক আমল বা সৎকর্ম চালিয়ে যেতে হবে।

উপসংহার:

এই আয়াতটি পাপীদের জন্য এক বড় আশার আলো। যতক্ষণ শ্বাস আছে, ততক্ষণ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না।

---

১৪৯. ما اثر القران فى حياة المؤمن؟ - [বিশ্বাসীর জীবনে কুরআনের প্রভাব কীরূপ?]

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আল ফুরকানের ৩০ নম্বর আয়াতে রাসূল (সা.) অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর উম্মত কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে (مَهْجُورًا)। এর বিপরীতে একজন প্রকৃত মুমিনের জীবনে কুরআনের প্রভাব হয় অপরিসীম ও বৈপ্লবিক।

কুরআনের প্রভাব:

১. অন্তর পরিবর্তন: কুরআন তিলাওয়াত মুমিনের অন্তরকে বিগলিত করে এবং আল্লাহর ভয়ে চোখ দিয়ে পানি ঝরায়। আল্লাহ বলেন, "যখন তাদের সামনে আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।" (সূরা আনফাল: ২)।

২. জীবন ব্যবস্থা: মুমিন কুরআনকে কেবল পড়ার কিতাব মনে করে না, বরং একে জীবনের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে। তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন কুরআনের নির্দেশে পরিচালিত হয়।

৩. অন্ধকার থেকে আলো: কুরআন মুমিনকে শিরক ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে তাওহীদের আলোয় নিয়ে আসে। এটি তার জন্য 'ফুরকান' বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

৪. প্রশান্তি: কুরআনের সংস্পর্শে মুমিনের অস্থির চিত্ত প্রশান্ত হয়। এটি আত্মার খোরাক এবং সব সমস্যার সমাধান।

উপসংহার:

বিশ্বাসীর জীবনে কুরআন জীবন্ত সাথীর মতো। যে কুরআনকে আঁকড়ে ধরে, দুনিয়া ও আখেরাতে সে কখনো পথভ্রষ্ট বা লজ্জিত হয় না।